International Multilingual Journal of Science and Technology (IMJST)
ISSN: 2528-9810
Vol. 9 Issue 1, January - 2024

অমুসলিম রাষ্ট্রের মুসলিম নাগরিকদের মুসলিম রাষ্ট্রে হিজরত: একটি ফিকহী পর্যালোচনা

IMMIGRATION OF NON-MUSLIM LAND'S MUSLIM CITIZENS TO THE LAND OF MUSLIMS: AN ANALYTICAL JURISPRUDENCE STUDY

১. মিসবাহ উদ্দিন
প্রভাষক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়,
চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ
ই-মেইল: mizbah@cu.ac.bd

২. মোঃ ইসহাক
প্রভাষক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়,
চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ
ই-মেইল: mdishaquecu@cu.ac.bd

সারসংক্ষেপ :

ইসলামী খিলাফাহর বিলুপ্তির পর আধুনিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায়

মুসলিম ও কাফির অধ্যুষিত রাষ্ট্রে মুসলিম জনগোষ্ঠী বসবাস শুরু করে। যার ফলে তাদের সাথে মিলেমিশে থাকা, ইসলামী শরীয়াহ বিরোধী সংবিধানসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে স্বেচ্ছায় কিংবা অনিচ্ছায় মুসলিম জনগোষ্ঠীর সম্মতি জ্ঞাপন করতে হচ্ছে। তাই অনেকাংশে তারা আল ওয়ালা ওয়াল বারা পরিপন্থী কার্যকলাপে লিপ্ত হচ্ছে। তখন কিছু প্রশ্ন সামনে আসে, ইসলামী শরীয়াহ আলোকে যে সব প্রশ্নের সমাধান জরুরী। যেমন, আধুনিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় দারুল ইসলাম ও দারুল কুফরধারণাদ্বয়ের শরীয়াহ দৃষ্টিকোণ কী? বর্তমান যুগে হিজরতের শরীয়াহদৃষ্টিকোণ কী? অমুসলিম রাষ্ট্রে মুসলিম জনগোষ্ঠীর অবস্থান করার ক্ষেত্রে ইসলামী শরীয়াহর বিধান কী? বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে এসব প্রশ্নের উত্তর খোঁজার প্রয়াস করা হয়েছে। অমুসলিম ও কাফির রাষ্ট্রে মুসলিম জনগোষ্ঠীর অবস্থান নিয়ে ইসলামী আইনতত্ত্ববিদগণের মধ্যে মতপার্থক্য থাকলেও আধুনিককালে শরীয়াহআইন বিশেষজ্ঞগণ ও ইসলামী আইনতত্ত্ববিদগণ নির্দিষ্ট কিছু শর্তসাপেক্ষে এর অনুমোদন দেন। প্রবন্ধটি পাঠান্তে জানা যাবে, শরীয়াহঅনুমোদিত প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলে কাফির ও অমুসলিম রাষ্ট্রে মুসলিম জনগোষ্ঠী অবস্থান করতে পারবে। মাকাসিদুশশরীয়াহ, সর্বোচ্চ মানবকল্যাণ ও নিরবিচ্ছিন্ন ইসলামী দাওয়াহ কার্যক্রম পরিচালনা প্রভৃতি উদ্দেশ্যে অমুসলিম ও কাফির রাষ্ট্রে অবস্থান করার শরীয়াহ অনুমোদন রয়েছে। বরং ক্ষেত্র বিশেষে তা ওয়াজিব ও আবশ্যকও বটে।

Abstract

After the dissolution of the Islamic Caliphate, the Muslim population began to live in the states dominated by non-Muslims and infidmmels in the modern state system. As a result the Muslim population has to consent willingly or unwillingly in various fields including the anti-Islamic Shariah constitution to be in harmony with them. So to a large extent they are indulging in activities contrary to Al Wala Wal Bara.Then some questions come to the fore, all the questions that need to be solved in the light of Islamic Shariah. For example, what is the Shariah perspective of Darul Islam and Darul Harb's concepts in the modern state system? What is the Shariah perspective on Hijrah in the present era? What is the Islamic Shariah provision regarding the settlement of Muslim population in non-Muslim countries? An attempt has been made to find answers to these questions in this textual essay. Although there is a difference of opinion among Islamic jurists regarding the position of Muslim population in non-Muslim and Kafir states, modern Shariah law experts and Islamic jurists approve it subject

to certain conditions.After reading the article, it will be known that the Muslim population can stay in the Kafir and non-Muslim countries if the Shariah-approved requirements arise. There is Shariah approval for staying in non-Muslim and Kafir states for the purpose of Maqasidu Shariah, maximum human welfare and continuous Islamic Da'wah activities. Rather, it is obligatory and necessary in certain cases.

বিষয়সূচকশব্দ: দারুল ইসলাম; দারুল কুফর; হিজরত; মুসলিম রাষ্ট্র; ইসলামী আইন।

ভূমিকা

আল ওয়ালা তথা মহান রাব্বুল আলামীন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও মুমিনগণকে গভীরভাবে ভালোবাসা ও আল বারা তথা মহান আল্লাহ্, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও মুমিনদের শত্রু কাফির ও অমুসলিমদের প্রতি শত্রুতা ও বিদ্বেষপোষণ, দুটিই ঈমানের অবিচ্ছেদ্য অংশ। মুমিন মাত্রই মহান আল্লাহ, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও অপরাপর মুমিন ভাইদের প্রতি তাঁর হৃদয়ে ভালোবাসা থাকতে হবে। অন্যদিকে কাফির ও অমুসলিমদের প্রতি তাঁর শত্রুতা ও বিদ্বেষ পোষণ করতে হবে। অন্যথায় সে প্রকৃত মুমিন হিসেবে গণ্য হতে পারে না। ইসলামের প্রারম্ভিক মুহূর্তে সাইয়িদুনা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর অনুসারী সাহাবীগণের উপর তৎকালীন মক্কার কাফির ও মুশরিকরা অবর্ণনীয় নির্যাতন ও নিপীড়ন চালায়। এমন কোনো পদ্ধতি অবশিষ্ট ছিলো না, যার মাধ্যমে তারা মুসলিম জনগোষ্ঠীকে কোণঠাসা করে রাখার চেষ্টা করেনি। কিন্তু তাদের অত্যাচার চরম পর্যায়ে পৌঁছালে আল্লাহর প্রত্যাদেশে কাফির ও মুশরিকদের করাল গ্রাস থেকে রক্ষা পেতে সাহাবীগণ দুই দুইবার হাবশায় হিজরত করেন। অবশেষে মক্কার কাফির ও মুশরিকরা এক পর্যায়ে সাইয়িদুনা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্মিলিত প্রয়াসে হত্যার গোপন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হলে মহান আল্লাহ্ তাঁকে মদীনায় হিজরত করার প্রত্যাদেশ দেন। যার ফলে একদিকে যেমন মুমিনগণ মক্কার কাফির ও মুশরিকদের অত্যাচার, জুলুম, নির্যাতন ও নিপীড়ন থেকে মুক্তি পায়। অপরদিকে নিরবচ্ছিন্নভাবে ব্যাত্যয়হীন ধর্ম-কর্ম পালনে সক্ষমতা অর্জন করে। পরবর্তীতে ইসলামী আইনতত্ত্ববিদগণ হিজরতের বিধানের কার্যকারণ অনুসন্ধান করে দারুল ইসলাম ও দারুল কুফর ধারণাদ্বয় ইজতিহাদ করেন। তবে খিলাফাহ্ বিলুপ্তির পর প্রচলিত আধুনিক রাষ্ট্র ব্যবস্থার উদ্ভব হলে অনেক মুসলিম অমুসলিম প্রধান রাষ্ট্রে বসবাস করতে থাকে। ফলে অনেকাংশে অমুসলিমদের সাথে সম্প্রীতি বজায় রেখে চলতে হয়। যাতে আল ওয়ালা ওয়াল বারার ব্যত্যয় ঘটার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। তাই অমুসলিম প্রধান রাষ্ট্রে মুসলিমদের অবস্থান বৈধ হবে নাকি হবে না? খিলাফাহ্ বিলুপ্ত হওয়ায় দারুল ইসলাম ও দারুল কুফর ধারণাদ্বয়ের শরীয়াহ্ স্বরুপ কী হবে? বর্তমান সময়ে হিজরতের ব্যাপারে ইসলামী শরীয়াহর অবস্থান কী? বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে বর্ণনামূলক ও বিশ্লেষণমূলক পদ্ধতি অনুসরণ করে মাকাসিদুশ শরীয়াহর আলোকে উল্লিখিত প্রশ্নের ফিকহী সমাধানের প্রয়াস করা হয়েছে। আলোচনার সুবিধার্তে প্রথমে হিজরত নিয়ে আলোচনা করা হবে।

হিজরত : প্রাসঙ্গিক বিষয়াবলি

'হিজরত' (الهجرة)শব্দটি আরবী। এর আভিধানিক অর্থ হলোবিচ্ছেদ(المفارقة); পরিহার করা (الترك); বিচ্ছিন্ন হওয়া(التقاطع) প্রভৃতি। (আবুল ফযল ইবনু মানযুর, লিসানুল আরব, বৈরুত: দারু সাদির, প্রথম সংস্করণ) খ. ৫, পৃ. ২০৫; আবুল হুসাইন ইবনু ফারিস, মুজামু মাকায়িসুল লুগাহ, (ইত্তিহাদুল কিতাবিল আরব, ২০০২ খ্রি.) খ. ৬, পৃ. ৩৪।)

ইবনু ফারিস রাহ: হিজরতের অর্থকে দুটি মূল নীতিতে বিভক্ত করেন।

(১) হিজরতে বিচ্ছিন্ন হওয়া ও বিচ্ছেদ হওয়া পাওয়া যেতে হবে।

(২) হিজরতে কোনো বিষয়ের সাথে সংযুক্তি ও বন্ধন পাওয়া যাবে। (প্রাগুক্ত, খ. ৬ পৃ. ৩৪।)

একজন ব্যক্তির সাথে অপর ব্যক্তির শারীরিক বা আত্মিক বিচ্ছেদ কিংবা কথার বিচ্ছেদও হতে পারে।

আবার হারিস সুলাইমান ফারুকী (রাহ.) তার আইন অভিধানে বলেন,

Immigration,

مهاجرة : قدوم الأجانب إلى البلاد لإقامة دائمة فيها.

অথার্ৎ হিজরত বলা হয় ভিনদেশীদের স্থায়ী আবাসনের জন্য কোনো রাষ্ট্রে গমন করা। (হারিস সুলাইমান আল ফারুকী, আল মুজামুল কানুনী, (বৈরুত: মাকতাবাতু লুবনান, পঞ্চম সংস্করণ, ২০০৮ খ্রি.) পৃ. ৩৪৭।)

অক্সফোর্ড ডিকশনারি অব'ল'তে বলা হয়,

Immigration *n.* The act of entering a country other than one`s native country with the intention of living there permanently.

অর্থাৎ হিজরত (বিশেষ্য), স্বীয় রাষ্ট্র ভিন্ন অন্য কোনোরাষ্ট্রে স্থায়ীভাবে আবাসনের উদ্দেশ্যে প্রবেশ করা। (Elizabeth A. Martin, *A Dictionary of Law*, (Oxford: Oxford University Press, Fifth Ed. 2003) p. 241.)

তবে ইসলামী শরীয়াহর পরিভাষায় বিশেষজ্ঞগণ হিজরতের সংজ্ঞায়নে বিভিন্ন পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন। কখনো সংজ্ঞাটি বেশি ব্যাপক হয়ে পড়েছে। আবার কখনো বা বেশি বিশেষ হয়ে গিয়েছে। যেমন আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ুতী (রাহ.) বলেন, হিজরত হলো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও মুসলিমগণকে শক্তিশালী করা ও কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে মুসলিমগণকে সহযোগিতা করার উদ্দেশ্যে মক্কা থেকে প্রস্থান করে মদীনায় স্থানান্তরীত হওয়া। (জালালুদ্দীন সুয়ুতী, হাশিয়াতুস সুয়ুতী ওয়াস সুনদী আলা সুনানিন নাসায়ী, বৈরুত: দারুল মারিফা, ১৪২৪ হি.)খ. ৫ পৃ. ৪৬৫।)

উপর্যুক্ত সংজ্ঞায় আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে মক্কা থেকে মদীনায় হিজরতের সাথে হিজরতকে সীমাবদ্ধ করে ফেলা হয়।

কালাজীর সংজ্ঞা থেকেও তা বুঝা যায়। তিনি বলেন, মক্কা বিজয় পর্যন্ত আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও মুমিনগণ কর্তৃক যে প্রস্থান সম্পন্ন হয়েছিলো, তাই হিজরত। সে হিজরত দারুল কুফর মক্কা থেকে দারুল ইসলাম মদীনাহ মুনাওয়ারার দিকে সংঘটিত হয়েছিলো। (মুহাম্মাদ রাওয়াস কালাজী, মুজামু লুগাতিল ফুকাহা, (বৈরুত: দারুন নাফায়িস, প্রথম সংস্করণ, ১৯৯৬ খ্রি.) পৃ. ৪৬৪।)

সংজ্ঞাদ্বয় থেকে সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, হিজরত শুধু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগের সাথে নির্দিষ্ট। যা জামি' ও ব্যাপক সংজ্ঞার পরিপন্থী।

অনেকেই হিজরতের সংজ্ঞায় দারুল ইসলাম ও দারুল কুফরকে আমলে নিয়েছেন। তারা দারুল কুফর থেকে দারুল ইসলামের দিকে স্থানান্তরীত হওয়াকে হিজরত হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। তাদের মাঝে আবার অনেকেই দারুল কুফর এর পরিবর্তে দারুল হারব ব্যবহার করেছেন। তারা বলেন, দারুল হারব থেকে দারুল ইসলামের দিকে স্থানান্তরীত হওয়াই হিজরত। তবে তাতে হিজরতের সংজ্ঞাটি ব্যাপক ও জামি' না হয়ে সংকুচিত ও সীমাবদ্ধ হয়ে যায়। কারণ, দারুল আ'হদ দারুল কুফর হলেও দারুল হারব নয়। (আব্দুর রহমান ইবনু কুদামাহ, আশ শারহুল কবীর, (বৈরুত: দারুল কিতাবিল আরবী লিন নাশর, তাহকীক: রশীদ রেজা) খ. ১০, পৃ. ৩৭৯; আবু বকর ইবনুল আরাবী, আহকামুল কুরআন, (বৈরুত: দারু ইহইয়াউত তুরাসিল ইলমী, প্রথম সংস্করণ, তাহকীক: আলী মুহাম্মদ) খ. ১, পৃ. ৪৮৪; শিহাবুদ্দীন আহমদ ইবনু হাজর, ফাতহুল বারী, (বৈরুত: দারুল ফিকর, ২০১১) খ. ১, পৃ. ১৬।)

অনেকেই আবার দারুল ইসলাম ও দারুল কুফর এর সাথে ব্যাপক শর্ত জুড়ে দেন, যার ফলে সংজ্ঞাটি অনেক ব্যাপক ও জামি' হয়ে যায়। যেমন, আল্লামা আত তারতুসতী বলেন, দারুল কুফর থেকে দারুল ইসলামের দিকে ও তুলনামূলক অধিক ফিতনাযুক্ত রাষ্ট্র থেকে কম ফিতনাযুক্ত রাষ্ট্রের দিকে আল্লাহর রাস্তায় প্রস্থান করাই হলো হিজরত। (আবু বাসীর আত তারতুসী, আল হিজারাতু মাসায়িলু ওয়া আহকাম, ২০০১খ্রি.) পৃ. ১১।)

উপর্যুক্ত সংজ্ঞাটি অনেক ব্যাপক ও জামি'। কারণ, দারুল কুফর থেকে দারুল ইসলামের দিকে স্থানান্তরীত হওয়ার সাথে হিজরত সীমাবদ্ধ নয়। বরং অনেক সময় নিরাপত্তার দিক বিবেচনায় এক দারুল কুফর থেকে অপর দারুল কুফরের দিকে হিজরত করা যুক্তিযুক্ত। যেমনটা মক্কা থেকে হাবশার দিকে

হিজরতের সময় পরিলক্ষিত হয়। কখনো বা আবার বিদআ'ত প্রচলিত আছে, এমন রাষ্ট্র থেকে বিদআ'ত মুক্ত দারুস সুন্নাহে হিজরত করা হয়। কিংবা দারুল কুফর থেকে মুসলিম বান্ধব অমুসলিম রাষ্ট্র, যারা মুসলিমগণের সাথে চুক্তিবদ্ধ দারুল আ'হদের দিকে হিজরত করা হয়। কখনো দারুল ইসলামে জুলুম-নিপীড়ন বেড়ে গেলে দারুল কুফরের দিকেও হিজরত করা ন্যায়সঙ্গত, যা উপর্যুক্ত সংজ্ঞার আওতাধীন। (প্রগুক্ত; ফালাহ জারদুমি, ফিকহুস সিয়াসাতুশ শরয়িয়্যাহ লিল আকাল্লিয়্যাতিল মুসলিমাহ, ২০০৬ খ্রি., পৃ. ১৫২।)

হিজরতের সংজ্ঞায়নে অনেকে আধ্যাত্মিক দিকটা বিবেচনায় রেখেছেন। তাদের মতে হিজরত নির্দিষ্ট কোনো সময় বা নির্দিষ্ট রাষ্ট্রের মাঝে সীমাবদ্ধ নয়। বরং হিজরত শারীরিক কার্যক্রম ও বস্তুগত কর্মের পাশাপাশি নৈতিক মূল্যবোধকেও অন্তর্ভুক্তকরে। আল্লামা ইবনু হাজার (রাহ.) এর সংজ্ঞায়নে তা ফুটে উঠে। তিনি বলেন,

الهجرة ترك ما نهى الله عنه.

হিজরত হলো আল্লাহ কর্তৃক নিষিদ্ধ বিষয় পরিত্যাগ করা। (শিহাবুদ্দীন আহমদ ইবনু হাজার, ফাতহুল বারী, (বৈরুত: দারুল ফিকর, ২০১১ খ্রি.) খ. ১, পৃ. ৫৪।)

সে ক্ষেত্রে তিনি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একটি হাদীস প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপন করেন। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

المهاجر من هجر ما نهى الله عنه.

অথার্ৎ তিনিই মুহাজির, যিনি আল্লাহ্ কর্তৃক নিষিদ্ধ বিষয় পরিত্যাগ করেন। (ইমাম আহমদ, মুসনাদুল ইমাম আহমাদ, (মুআসসাসাতুর রিসালাহ, তাহকীক: আল আরনাউত) খ. ১১, পৃ. ৫১১।)

ইবনু হাজার (রাহ.) প্রদত্ত সংজ্ঞা মতে হিজরতের দুটি দিক পাওয়া যায়। ক) অভ্যন্তরীণ ও আধ্যাত্মিক খ) বাহ্যিক।

শয়তানের প্ররোচনা ও কুপ্রবৃত্তি মুক্ত হয়ে শরীয়াহ্ নিষিদ্ধ বিষয় থেকে বিরত থাকা অভ্যন্তরীণ ও আধ্যাত্মিক হিজরত। আর ইসলাম পালনে ফিতনাফাসাদ বাদ দিয়ে ফিতনামুক্ত জায়গায় প্রস্থান করাই হলো বাহ্যিক হিজরত। যেখানে বাহ্যিক হিজরত অভ্যন্তরীণ ও আধ্যাত্মিক হিজরতের আগে। আর অভ্যন্তরীন ও আধ্যাত্মিক হিজরত বাহ্যিক হিজরতের মূল।

অনেক ইসলামী স্কলার হিজরতের আভিধানিক ও শরয়ী সংজ্ঞার মাঝে সামঞ্জস্য সাধণ করার প্রয়াস করেছেন। তারা হিজরতের শরয়ী সংজ্ঞায়নে আভিধানিক অর্থকে আমলে নিয়ে বলেন, নিজেদের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে কোনো জনসমষ্টির এক ভূখণ্ড ছেড়ে অন্য ভূখণ্ডে প্রস্থান করা ও এক স্থান ছেড়ে অন্য স্থানে স্থানান্তরীত হওয়াই হিজরত। (ড. মারযুক আব্দুস সাবুর, মাফাহীমু ইসলামিয়্যাহ, (মুআসসাসাতুর রিসালাহ, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৯৩ খ্রি.) পৃ. ৩০৬।)

আল্লামা জুরজানীর সংজ্ঞায়নও তা সমর্থন করে। তিনি বলেন,

هي ترك الوطن إلى بلد غيره للإقامة فيه.

অপর রাষ্ট্রে স্থায়ী আবাসনের উদ্দেশ্যে নিজের রাষ্ট্র পরিত্যাগ করাই হিজরত। (আলী আল কাজী আল জুরজানী, আত তা'রীফাত, (বৈরুত: দারুল কিতাবিল আরবী, ১৪০৫ হি.) খ. ১, পৃ. ৩১৯।)

উপর্যুক্ত সংজ্ঞাদ্বয়ে শরয়ী সংজ্ঞায়নে আভিধানিক অর্থকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। যার মাধ্যমে আধুনিক মাইগ্রেশনও অন্তর্ভুক্ত।

পাশাপাশি বর্তমানে প্রাচীন শরয়ী গভীরতা বিদ্যমান নেই। বরং বস্তুগত বাহ্যিক বিষয় মূখ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। বর্তমানে হিজরতের এমন অনেক ধারণা বিদ্যমান রয়েছে, যা প্রাচীন হিজরতে ছিলো না বললেই চলে। প্রাচীন হিজরতের মূল কারণ ছিলো ইসলাম ধর্ম রক্ষা, প্রাণের নিরাপত্তা। সবোর্পরি উত্তম রিজিকের অন্বেষণ। আধুনিক কালে রাজনৈতিক, আর্থ-সামাজিক ও জ্ঞানার্জন প্রভৃতি হিজরতের মূল নিয়ামক।

হিজরত ও আল ওয়ালা ওয়াল বারা:

আল ওয়ালা অর্থ আল্লাহ, তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও মুমিনগণকে ভালোবাসা। আর আল বারা অর্থ আল্লাহ, তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও মুমিনগণের শত্রু কাফির ও মুশরিকদের প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করা। দুটি কারণে আল ওয়ালা ওয়াল বারা গুরুত্বপূর্ণ। ক) তা তাওহীদ ও একত্বের বিশ্বাসের সাথে সম্পর্কিত। খ) তা ঈমানের অন্যতম প্রমাণ। (মুহাম্মদ ইবনু সাঈদ আল কাহতানী, আল ওয়ালা ওয়াল বারা ফিল ইসলাম, (রিয়াদ: দারু তাইবা, ষষ্ঠ সংস্করণ, ১৪১৩ হি.) পৃ. ৪০।)

অমুসলিম রাষ্ট্রে বসবাসকারী অনেক মুসলিমের অবস্থা এতোই নাজুক যে, অমুসলিম ও কাফির থেকে মুসলিমগণকে আলাদা করা যায়, এমন বৈশিষ্ট্যের ব্যাপারে তারা উদাসীন। যা তাদের ঈমানকে ক্রমান্বয়ে দূর্বল করে ফেলে। পাশাপাশি তারা নিজেদের মাঝে অমুসলিম ও কাফিরদের অনেক বৈশিষ্ট্য ধারণ করে, যা একজন প্রকৃত মুমিনের জন্য সমীচীন নয়। এক পর্যায়ে তারা অমুসলিম ও কাফিরদের নিজেদের অন্তরঙ্গ বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করে। পক্ষান্তরে অনেক মুমিনের প্রতি অবজ্ঞা ভরে অপদস্ত করে এবং ক্ষেত্র বিশেষে অনেক মুমিনের প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করে। (মুহাম্মদ ইবনু সাঈদ আল কাহতানী, আল ওয়ালা ওয়াল বারা ফিল ইসলাম, (লন্ডন: আল ফিরদাউস লিমিটেড, ১৯৯২ খ্রি.) খ. ২, পৃ. ৫।)

তাই অনেক ইসলামিক স্কলার মনে করেন, অমুসলিম ও কাফির রাষ্ট্রে বসবাসকারী মুসলিমদের ইসলামী রাষ্ট্রের দিকে হিজরত করতে হবে। কারণ, হিজরত ও আল ওয়ালা ওয়াল বারার মাঝে সুগভীর সম্পর্ক রয়েছে। বলতে গেলে হিজরত হলো আল ওয়ালা ওয়াল বারার অন্যতম শাখা। (মুহাম্মদ ইবনু সাঈদ আল কাহতানী, আল ওয়ালা ওয়াল বারা ফিল ইসলাম, (রিয়াদ: দারু তাইবা, ষষ্ঠ সংস্করণ, ১৪১৩ হি.) পৃ. ২৮২।)

আল্লামা কাহতানী যাদের অন্যতম। তাদের আরো দাবি হলো, মুসলিমগণ ইসলামোফোবিক পরিবেশ থেকে দূরে সরে যেতে বাধ্য। (প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭১।)

শুধু ততোটুকুতে সীমাবদ্ধ নয়। তারা আরো বলেন, দারুল কুফর থেকে দারুল ইসলামের দিকে হিজরতের বিধান কিয়ামত সংঘটিত হওয়া পর্যন্ত বলবত থাকবে। (প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৬।)

তাদের যুক্তিসমূহ:

ক) নবাগত ইসলামী মতাদর্শের শত্রু কাফির ও মুশরিকদের ধারাবাহিক নির্যাতন-নিপীড়ন সহ্য করার পর সাইয়িদুনা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর অনুসারী সাহাবায়েকেরাম (রা.)মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করে ইসলামী রাষ্ট্রের গোড়াপত্তন করেন। তা থেকে বুঝা যায়, যে রাষ্ট্র মুসলিম কতৃর্ত্বাধীন ও ইসলামী শরীয়াহ্ দ্বারা পরিচালিত, সে রাষ্ট্রের দিকে হিজরত করে তাতে স্থানান্তরীত হতে হবে। (মুহাম্মদ ইবনু সাঈদ আল কাহতানী, আল ওয়ালা ওয়াল বারা ফিল ইসলাম, (লন্ডন: আল ফিরদাউস লিমিটেড, ১৯৯২ খ্রি.) খ. ৩, পৃ. ১১।)

খ) অমুসলিম ও কাফিরদের মাঝে অবস্থান করার ফলে মুসলিম নিজেকে একা ও দূর্বল মনে করে। তাই তার মাঝে বশীভূত হওয়া ও নতিস্বীকারের মানসিকতা তৈরী হতে থাকে। যা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়ে এমন অবস্থার সৃষ্টি করে, যা অমুসলিম ও কাফিরদের কল্যাণ সাধন ও তাদের তল্পিবাহক হতে তাকে প্ররোচিত করে। (মুহাম্মদ ইবনু সাঈদ আল কাহতানী, আল ওয়ালা ওয়াল বারা ফিল ইসলাম, (রিয়াদ: দারু তাইবা, ষষ্ঠ সংস্করণ, ১৪১৩ হি.) পৃ. ২৭১।) এমন পরিবর্তন আল ওয়ালা ওয়াল বারা পরিপন্থী। তাই অমুসলিম ও কাফির রাষ্ট্রের মুসলিম অধিবাসীদের মুসলিম রাষ্ট্রের দিকে হিজরত করা আবশ্যক।

গ) প্রত্যেক মুসলিমের জন্য হালাল অন্বেষণ করা ফরজ। তাই যে সব রাষ্ট্রে হারাম প্রাধান্য পায়, সে সব রাষ্ট্র থেকে হিজরত করে স্থানান্তরীত হয়ে যেতে হবে। (প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৭।)

ঘ) ইসলামের কর্তৃত্ব নেই, এমন রাষ্ট্রে মুসলিম অবস্থান করা নিষিদ্ধ ও হারাম। তাই অমুসলিম ও কাফির রাষ্ট্রের মুসলিম অধিবাসীদের মুসলিম রাষ্ট্রের দিকে হিজরত করা আবশ্যক। কারণ, মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلآئِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُواْ فِيمَ كُنتُمْ قَالُواْ كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الأَرْضِ قَالُوَاْ أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُواْ فِيهَا فَأُوْلَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءتْ مَصِيراً﴾

যারা নিজের অনিষ্ট করে, ফেরেশতারা তাদের প্রাণ হরণ করে বলে, তোমরা কী অবস্থায় ছিলে? তারা বলে : এ ভূখণ্ডে আমরা অসহায় ছিলাম। ফেরেশতারা

বলে : আল্লাহর পৃথিবী কি প্রশস্ত ছিলো না যে, তোমরা দেশ ত্যাগ করে সেখানে চলে যেতে? অতএব, তাদের বাসস্থান হল জাহান্নাম এবং তা অত্যন্ত মন্দ স্থান। (আল কুরআন ৪: ৯৭)

উপর্যুক্ত আয়াত ঘোষণা দেয় যে, ইসলামের প্রতি শত্রুতা ও বৈরিতা কিংবা বৈষম্য প্রদর্শন করা হয় না এমন রাষ্ট্রের দিকে হিজরত করতে হবে। আল্লামা বায়জাভী (রাহ.) ও ইবনু কাসীর (রাহ.) উপর্যুক্ত আয়াতের তাফসীরে এমনটা মন্তব্য করেন। (নাসিরুদ্দীন আল বায়জাভী, তাফসীরুল বায়জাভী, (ইস্তাম্বুল: মাকতাবাতুল হাকীকাহ, ১৯৯৮ খ্রি.) পৃ. ৯২; ইমাদুদ্দীন ইবনু কাসীর, তাফসীরুল কুরআনিল আজীম, (কর্ডোবা: মুআসসাসাতু কারতুবা, ১৯৯৯ খ্রি.) পৃ. ৩৯১।)

এই আয়াতের তাফসীরে সাঈদ কুতুব (রাহ.) বলেন, মক্কায় ধর্মীয় বৈষম্যের কারণে মুসলিমগণকে হিজরতের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছিলো। বিশেষত দারুল ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর হিজরত আবশ্যক করে দেওয়া হয়েছিলো। (সাঈদ কুতুব, ফী যিলালিল কুরআন, (কায়রো: দারুশ শুরুক, ২০০৪ খ্রি.) পৃ. ৭৪৩।)

গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় যে, উপর্যুক্ত আয়াতটি মাকাসিদুশ শরীয়াহর বাস্তবায়ন ও প্রয়োগ। হিজরত ও মাকাসিদুশ শরীয়াহ্ পারস্পরিক সম্পর্যুক্ত। মাকাসিদুশ শরীয়াহ আওতাভুক্ত বিশ্বাস রক্ষা, সম্মান রক্ষা ও প্রাণ রক্ষার নিমিত্তে হিজরতের বিধান প্রযোজ্য হয়। ইসলামী বিশ্বাসের অস্তিত্ব সুনিশ্চিতকল্পে হিজরতের প্রয়োজন ছিলো। মুসলমানগণ যেভাবে মক্কায় নির্যাতিত হচ্ছিলেন, তা প্রতিরোধে; বিশেষত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্মিলিত হত্যার ষড়যন্ত্রের পর হিজরতের নির্দেশনা আসে। হিজরতের মাধ্যমে ইসলামী বিশ্বাস বিলুপ্তির শংকা থেকে সুরক্ষা পায়। তাই হিজরতের মাধ্যমে মাকাসিদুশ শরীয়াহ আওতাভুক্ত বিশ্বাস রক্ষার দিকটি নিশ্চিত করা হয়।

এছাড়া মক্কায় অবস্থানকালীন মুমিনগণ কাফিরদের পক্ষ থেকে আর্থ-সামাজিক নিষেধাজ্ঞার শিকার হন। মক্কার কাফির ও মুশরিকরা মুমিনদের সাথে বৈবাহিক বন্ধন ও ব্যবসা-বাণিজ্য বর্জন করে। হিজরতের মাধ্যমে মুমিনগণ তাদের হারানো সম্মান ফিরে পান। এভাবে হিজরতের মাধ্যমে মাকাসিদুশ শরীয়াহ আওতাভুক্ত সম্মান রক্ষার দিকটি সুনিশ্চিত হয়।

পাশাপাশি মক্কায় অবস্থানকালীন মুমিনগণ প্রাণের হুমকির মুখে ছিলেন। অনেকেই কাফির ও মুশরিকদের হাতে শহীদ হন। বিশেষত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রাণনাশের সম্মিলিত ষড়যন্ত্রের পর হিজরতের নির্দেশনা আসে। এভাবে হিজরতের মাধ্যমে মাকাসিদুশ শরীয়াহ আওতাভুক্ত প্রাণ রক্ষার দিকটি সুনিশ্চিত হয়।

তাই উপর্যুক্ত আয়াতটি মাকাসিদুশ শরীয়াহর প্রয়োগ ও বাস্তবায়ন।

তবে ইসলামী বিশ্বাসের কারণে অমুসলিম ও কাফির রাষ্ট্রে কোনো বৈষম্য ও প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন না হলে তাতে মুসলিমগণের অবস্থানের অনুমোদন রয়েছে। আধুনিক অনেক ফকীহ এমতামত ব্যক্ত করেছেন। যাদের মাঝে অন্যতম হলেন শায়খ জাদ আল হক, মিসরের আযহারের সাবেক শায়খ প্রমূখ।

যদি রাষ্ট্রটি ধর্ম নিরপেক্ষ কিংবা সকল ধর্মের সহাবস্থানের অনুমোদন দেয় এবং কোনো মুসলিম মনে করেন যে, তার ধর্ম সেখানে সুরক্ষিত ও তিনি সেখানে স্বাধীনভাবে ধর্ম পালন করতে পারবেন, তখন তিনি তাতে অবস্থান করতে পারবেন। কিন্তু যদি তিনি ধর্ম পালনে কোনো ফিতনার আশংকা করেন, তবে ধর্ম পালনের নিশ্চয়তা আছে, এমন রাষ্ট্রে তাকে স্থানান্তরীত হয়ে যেতে হবে। (সুলাইমান মুহাম্মদ তুবুলিয়্যাক, আল আহকামুস সিয়াসিয়্যাহ লিল আকাল্লিয়্যাতিল মুসলিমাহ, (আম্মান: দারুন নাফাইয়িস, ১৯৯৭ খ্রি.।)

আল্লামা কাহতানী প্রমুখ তারাও এব্যাপারে একমত যে, অমুসলিম রাষ্ট্রে অবস্থান করতে চাইলে মুসলিমগণের স্বাধীনভাবে ইসলাম ধর্ম পালন করার সক্ষমতা থাকতে হবে। পাশাপাশি আরেকটি শর্ত তারা জুড়ে দেন। স্বাধীনভাবে ইসলাম ধর্ম পালন করার সক্ষমতার সাথে ইসলামকে প্রকাশ করার সক্ষমতাও থাকতে হবে। (মুহাম্মদ ইবনু সাঈদ আল কাহতানী, আল ওয়ালা ওয়াল বারা ফিল ইসলাম, (রিয়াদ: দারু তাইবা, ষষ্ঠ সংস্করণ, ১৪১৩ হি.) পৃ. ২৭১।)

তাদের ভাষ্য মতে ইসলাম প্রকাশ অর্থ শুধু নামাজের অনুমোদন অছে, ধর্মপালনে কোনো বাঁধা নেই, এতটুকু যথেষ্ট নয়। বরং ইসলাম প্রকাশ করার অর্থ হলো সরাসরি কাফিরদের সাথে শত্রুতার ঘোষণা দেওয়া। (প্রাগুক্ত, ২৭৭।)

তাদের মতে অমুসলিম রাষ্ট্রে মুসলিমগণের বসবাসের অনুমোদনের জন্য প্রকাশ্যে কাফির ও অমুসলিমদের প্রতি শত্রুতার ঘোষণা দিতে হবে। তাদের ধর্ম থেকে নিজেদের দায়মুক্তির ঘোষণা না আসলে ইসলাম প্রকাশের শর্ত পূরণ হবে না।

তবে এভাবে ঘোষণা দিলে বিশ্বাসের স্বাধীনতা খর্ব হবে। আর বহু ধর্মীয় শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানে ব্যঘাত ঘটাবে। অথচ ইসলাম সূচনালগ্ন থেকেই বিশ্বাসের স্বাধীনতা ও বহু ধর্মীয় শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানকে সমর্থন করে। যেমন মহান রাব্বুল আলামীন বলেন,

لا إكراه في الدين.

অর্থাৎ ধর্মের ক্ষেত্রে কোনো বাড়াবাড়ি নেই। (আল কুরআন ২: ২৫৬)

কেউ ধর্মীয় বিশ্বাসে দ্বিমত পোষণ করলে বা অস্বীকার করলে কিংবা কারো ভিন্ন মত থাকলে তার সাথে বাড়াবাড়ি ও তাকে শাস্তি দেওয়া যাবে মর্মে কুরআনের কোথাও অনুমোদন নেই।

এখন আমাদের সামনে দুয়েকটি প্রশ্ন আসে। ক) শারীরিক হিজরত না করে আধ্যাত্মিক হিজরত করা সম্ভব কিনা? খ) দারুল ইসলাম কি ভৌত ভৌগোলিক বাস্তবতা নাকি মুসলিমগণ নিজেদের প্রভাব ও বৃত্তের মধ্যে দারুল ইসলামকে সমুন্নত রাখতে পারেন? গ) মুসলিমগণকে বিশ্বাস রক্ষা, সম্মান রক্ষা ও প্রাণ রক্ষার জন্য মুসলিম রাষ্ট্রের দিকে হিজরতের নির্দেশনা দেওয়া হয়। যদি এমন হয় যে, মুসলিম রাষ্ট্রে মুসলিমগণ নির্যাতনের শিকার হচ্ছেন, এমতাবস্থায় মুক্তির একমাত্র জায়গা হলো অমুসলিম রাষ্ট্র, তখন মুসলিম রাষ্ট্রে তাদের নির্যাতিত হয়েও অবস্থান করা আবশ্যক কিনা?

উপর্যুক্ত প্রশ্নসমূহের উত্তর খোঁজার আগে দারুল ইসলাম ও দারুল কুফর নিয়ে আলোচনা করা জরুরি। তাই নিম্নে দারুল ইসলাম ও দারুল কুফরের আলোচনা করা হলো :

দারুল ইসলাম ও দারুল কুফর : প্রাসঙ্গিক আলোচনাসমূহ

রাষ্ট্র বিভাজন

প্রাচীন ইসলামী অইনতত্ত্ববিদগণ রাষ্ট্র বিভাজনে বিভিন্ন মতামত ব্যক্ত করেন। অধিকাংশ ফকীহ রাষ্ট্রকে দুভাগে বিভক্ত করেছেন। ১) দারুল ইসলাম ২) দারুল হারব (ড. ওয়াহবাহ আয যুহাইলী, আসরারুল হারব, (দারুল ফিকর, তৃতীয় সংস্করণ, ১৯৯৮ খ্রি.) পৃ. ১৬৭; আব্দুল ওয়াহহাব খাল্লাফ, আস সিয়াসাহ আশ শরয়িয়্যাহ, (মুআসসাসাতুর রিসালাহ, ২০০১ খ্রি.) পৃ. ৬৬।)

ইমাম শাফিয়ী (রাহ.) রাষ্ট্রকে তিনভাগে বিভক্ত করেন। ১) দারুল ইসলাম ২) দারুল হারব ৩) দারুল আহদ । (মুহাম্মদ ইবনু ইদরীস আশ শাফিয়ী, আল উম্মু, (দারুল ওয়াফা, ২০০১ খ্রি.) খ. ১, পৃ. ১৮২।)

রাষ্ট্র বিভাজনে যে মতানৈক্য দেখা দিয়েছে, তার কারণ হলো ফকীহগণের মাঝে এব্যাপারে মতানৈক্য দেখা দিয়েছে যে, রাষ্ট্র বিভাজন মূল নাস দ্বারা সাব্যস্ত নাকি গবেষণামূলক ও ইজতিহাদী বিষয়। সকল আধুনিক ফকীহ এ ব্যাপরে ঐকমত্য পোষণ করেন যে, প্রাচীন আইনতত্ত্ববিদগণ যেভাবে রাষ্ট্র বিভাজন কেরছেন, তা বিশুদ্ধ। তবে অধিকাংশ ফকীহ মনে করেন যে, রাষ্ট্র বিভাজন মূল নাস ও সূত্র দ্বারা প্রমাণিত। তাই সে বিভাজনের বিরোদ্ধাচরণ করা যাবে না। ড. আব্দুল আজীজ প্রমুখ এই মতের সমর্থন করেন। (ড. আব্দুল আজীজ আল আহমদী, ইখতিলাফুদ দারাইন ওয়া আসারুহু, (মদীনা: আল জামিয়াতুল ইসলামিয়্যাহ, প্রথম সংস্করণ, ২০০৪ খ্রি.) খ. ১, পৃ. ৩০১; ফালাহ জারদুমি, ফিকহুস সিয়াসাতুশ শরইয়িয়্যাহ লিল আকাল্লিয়্যাতিল মুসলিমাহ, ২০০৬ খ্রি., পৃ. ৮৫।)

ড. যুহাইলী, শায়খ আবু যাহরা, শায়খ খাল্লাফ, ড. ফাতানী ও ড. কারজাভীসহ অধিকাংশ আধুনিক ফকীহ মনে করেন যে, রাষ্ট্র বিভাজন গবেষণামূলক ও ইজতিহাদী বিষয়। যুগ সমস্যা সমাধানে ইজতিহাদের মাধ্যমে সে বিভাজন করা হয়। (ড. ওয়াহবাহ আয যুহাইলী, আসরারুল হারব, (দারুল ফিকর, তৃতীয়

সংস্করণ, ১৯৯৮ খ্রি.) পৃ. ১৯৩; মুহাম্মদ অবু যাহরা, নাযারিয়্যাতুল হারব ফিল ইসলাম, (কায়রো: দারুল ফিকর, ২০০৯ খ্রি.) পৃ. ১৪; আব্দুল ওয়াহহাব খাল্লাফ, আস সিয়াসাহ আশ শরয়িয়্যাহ, (মুআসসাসাতুর রিসালাহ, ২০০১ খ্রি.) পৃ. ৮৩; ড. ইউসুফ আল কারজাভী, ফিকহুল জিহাদ, (মাকতাবাতু ওয়াহবাহ, ২০০৯ খ্রি.) খ. ২, পৃ. ৮৮০।)

রাষ্ট্র বিভাজন গবেষণামূলক ও ইজতিহাদী হওয়া যুক্তিযুক্ত। ইজতিহাদী বিষয় বলেই রাষ্ট্র বিভাজনের মূলনীতিতেও মতানৈক্য দেখা দিয়েছে।

রাষ্ট্র বিভাজনের মূলনীতি :

ফকীহগণ যে মূলনীতি অনুসরণ করে রাষ্ট্রের বিভাজন করেছেন, তাতে ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। যেমন, মালিকী, শাফিয়ী, হাম্বালী সহ হানাফীদের মধ্যে ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (রাহ.) রাষ্ট্র বিভাজনের ক্ষেত্রে মুসলিম শাসকদের কর্তৃত্ব ও ইসলামী বিধান প্রচলনের দিকটি বিবেচনায় রেখেছেন। যে রাষ্ট্রে মুসলিম শাসকের কর্তৃত্ব থাকবে এবং ইসলামী বিধানের প্রচলন থাকবে, তা দারুল ইসলাম। অন্যথায় তা দারুল কুফর। আধুনিক ফকীহগণের মধ্যে আব্দুল আজিজ আহমদী এই মতকে প্রাধান্য দিয়েছেন। (মুহাম্মদ ইবনু সাঈদ আল কাহতানী, আল ওয়ালা ওয়াল বারা ফিল ইসলাম, (রিয়াদ: দারু তাইবা, ষষ্ঠ সংস্করণ, ১৪১৩ হি.) পৃ. ২৩৮; আব্দুর রহমান অস সা'দী, আল ফাতওয়াস সাদীয়্যাহ (কুয়েত: মারকাযুল বুহুস ওয়াদ দিরাসাত, ২০০২ খ্রি.) খ. ১, পৃ. ৯২; ড. আব্দুল আজীজ আল আহমদী, ইখতিলাফুদ দারাইন ওয়া আসারুহু, (মদীনা: আল জামিয়াতুল ইসলামিয়্যাহ, প্রথম সংস্করণ, ২০০৪ খ্রি.) খ. ১, পৃ. ২৩৮।)

ইমাম আবু হানিফা রাহ. মুসলিমগণের কর্তৃত্বের মাধ্যমে শান্তি, নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতা বিদ্যমান থাকার ভিত্তিতে রাষ্ট্র বিভাজন করেছেন। যদি মুসলিম কর্তৃত্বাধীন কোনো রাষ্ট্রে মুসলিম জনগোষ্ঠীর নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়, তাই দারুল ইসলাম। অন্যথায় তা দারুল কুফর। আধুনিক ফকীহগণের মধ্যে আবু যাহরা ও যুহাইলী রাহ এই মতকে প্রাধান্য দেন। তেমনভাবে আযহারের শায়খগণও এই মতকে প্রাধান্য দেন। (শামসুল আইম্মা মুহাম্মদ আস সুরাখসি, শারহুস সিয়ারিল কাবির, (দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, তাহকীক: মুহাম্মদ হুসাইন) খ. ৩, পৃ. ৮১; আলা উদ্দীন আল কাসানী, বাদাইউস সানাই, (বৈরুত: দারুল কুতুবিল আরবী, ১৯৮২ খ্রি.) খ. ৭, পৃ. ১৩০; মুহাম্মদ আবু যাহরা, আল আলাকাতুদ দুয়ালিয়্যাহ ফিল ইসলাম, (দারুল ফিকরিল আরবী, ১৯৯৫ খ্রি.) পৃ. ৫৭; ড. ওয়াহবাহ আয যুহাইলী, আসরারুল হারব, (দারুল ফিকর, তৃতীয় সংস্করণ, ১৯৯৮ খ্রি.) পৃ.১৭২)।

ইবুন কাইয়িম রাহ. এর মতে যে রাষ্ট্রে ইসলামী বিধিবিধান ও শিয়া'র বিদ্যমান থাকবে, তা দারুল ইসলাম। ইসলাম বিরোধী বিধিবিধান সেখানে থাকতেও পারে। ইসলামের সকল বিধান, শাস্তি আইন ও শিয়ার বিদ্যমান থাকুক কিংবা আংশিক বিদ্যমান থাকুক। (শামসুদ্দীন আবু আব্দিল্লাহ ইবনু কাইয়িম, আহকামু আহলিজ জিম্মাহ, (বৈরুত: দারু ইবনি হাযম, প্রথম সংস্করণ, ১৯৯৭ খ্রি.) খ. ২, পৃ. ৭২৮।)

অনেকেই নাগরিকদের আধিক্যের ভিত্তিতে রাষ্ট্রের বিভাজন করেন। যে রাষ্ট্রের অধিকাংশ নাগরিক মুসলিম, তা দারুল ইসলাম। যে রাষ্ট্রের অধিকাংশ নাগরিক অমুসলিম ও কাফির, তা দারুল কুফর। (মুহাম্মাদ রাওয়াস কালাজী, মুজামু লুগাতিল ফুকাহা, (বৈরুত: দারুন নাফায়িস, প্রথম সংস্করণ, ১৯৯৬ খ্রি.) পৃ. ২০৫।)

উপর্যুক্ত মতানৈক্য দেখে সহজেই অনুমেয় যে, প্রত্যেকেই সমসাময়িক পরিস্থিতি বিবেচনায় নিজের মতামত ব্যক্ত করেছেন। যারা ইসলামী রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব দেখেছেন, তারা সেটা বিবেচনায় রেখে রাষ্ট্রের বিভাজন করেছেন। আর যারা ইসলামী রাষ্ট্রের দূর্বল হওয়া দেখেছেন, তারা সেটা বিবেচনায় রেখে বিভাজন করেছেন। যারা ইসলামী খিলাফাতের বিলুপ্ত দেখেছেন, তারা নাগরিকদের আধিক্য বিবেচনায় রেখে রাষ্ট্র বিভাজন করেছেন।

তবে দারুল ইসলামও দারুল হারবের সমতুল্য হতে পারে, যদি দুর্নীতিগ্রস্ত বিশ্বাস অনুশীলন-চর্চা ব্যাপক হয়ে পড়ে। কিন্তু প্রকৃত দারুল ইসলামের অনুপস্থিতিতে মুসলিমগণ যতদিন দুর্নীতিগ্রস্ত অঞ্চলে তাদের ধর্ম পালন করতে পারে ততদিন তাতে

অবস্থান করতে পারবে। (A.K. Lambton, *State and Government in Medieval Islam*, (Oxford: Oxford University Press, 1981) p.261.)

প্রকৃত পক্ষে দারুল ইসলাম ও দারুল হারবের সংজ্ঞায়নে যে বিতর্ক তৈরী হয়েছে, তা অমিমাংসিত একটি বিতর্ক। বিশেষত রাষ্ট্র বিভাজনের ও শ্রেণিবিন্যাসের যে রীতি চলে আসছে, তা কুরআন থেকে নেওয়া হয়েছে, এমন নয়। আল আযহার ফাত্ওয়া কমিটির প্রাক্তন প্রধান আতিয়া সাকার তাঁর রচিত 'বয়ান লিন নাস' গ্রন্থে বলেন, রাষ্ট্রগুলোকে দারুল ইসলাম ও দারুল কুফর হিসেবে শ্রেণিবিন্যাসের ধারণাটি ইজতিহাদী ও পূর্ববর্তী ইসলামিক স্কলারগণের স্বাধীন বিচারের ফল। কুরআন ও সুন্নাহে ধারণাটির অস্থিত্ব নেই। (আতিয়া সাকার, বয়ান লিন নাস, কায়রো: আল আযহারুশ শরীফ।)

ইজতিহাদ কখনোই স্থায়ী সমাধান নয়। উল্লিখিত সব মতামত ইজতিহাদের ফলাফল, যা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য প্রযোজ্য।

আধুনিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় দারুল ইসলাম ও দারুল কুফর :

আধুনিক ইসলামী আইনতত্ত্ববিদগণ প্রচলিত রাষ্ট্র ব্যবস্থায় রাষ্ট্রের প্রকৃতি নিয়ে বিভিন্ন মতামত ব্যক্ত করেন। তাদের মতামত বিশ্লেষণ করল পাঁচ ধরণের মতামত পাওয়া যায়।

১) ড. আয যুহাইলী মনে করেন, বর্তমান রাষ্ট্রগুলো দারুল ইসলাম ও দারুল হারব হিসেবে বিভাজন করা যাবে না। বরং বিশ্বায়নের এই যুগে পৃথিবীর সব রাষ্ট্র যেনো একটি রাষ্ট্র। (ড. ওয়াহবাহ আয যুহাইলী, আসরারুল হারব, (দারুল ফিকর, তৃতীয় সংস্করণ, ১৯৯৮ খ্রি.) পৃ. ১৯৭।)

২) আল্লামা ফারিস আয যাহরানী প্রমূখ মনে করেন, বর্তমান বিশ্বের সকল রাষ্ট্রই দারুল কুফর। (আবু সালমান ফারিস আয যাহরানী, আল আলাকাতুদ দুয়ালিয়্যাহ ফিল ইসলাম, (মারকাযুদ দিরাসাত ওয়াল বুহুসুল ইসলামিয়্যাহ) খ. ১, পৃ. ৭৩।)

৩) ড. আব্দুল আজিজ আহমদী মনে করেন, বর্তমান বিশ্বের রাষ্ট্রগুলোকে দারুল ইসলম ও দারুল হারব হিসেবে ভাগ করা হবে।(ড. আব্দুল আজীজ আল আহমদী, ইখতিলাফুদ দারাইন ওয়া আসারুহু, (মদীনা: আল জামিয়াতুল ইসলামিয়্যাহ, প্রথম সংস্করণ, ২০০৪ খ্রি.) খ. ১, পৃ. ২৩৯।)

৪) শায়খ মুহাম্মদ আবু যাহরার মতে বর্তমানে রাষ্ট্রগুলোকে দারুল ইসলাম ও দারুল আ'হদ হিসেবে বিভক্ত করা হবে।(মুহাম্মদ আবু যাহরা, আল আলাকাতুদ দুয়ালিয়্যাহ ফিল ইসলাম, (দারুল ফিকরিল আরবী, ১৯৯৫ খ্রি.) পৃ. ৭৫।)

৫) ড. ইউসুফ আল কারজাভীর মতে বর্তমান বিশ্বের রাষ্ট্রগুলো তিনভাগে বিভক্ত করা যাবে। দারুল ইসলাম, দারুল হারব ও দারুল আহদ। মুসলিম রাষ্ট্রগুলো দারুল ইসলাম। জায়নিস্ট ইহুদি কর্তৃত্বের রাষ্ট্র দারুল হারব। আর অন্যান্য সকল রাষ্ট্র দারুল আহদ। (ড. ইউসুফ আল কারজাভী, ফিকহুল জিহাদ, (মাকতাবাতু ওয়াহবাহ, ২০০৯ খ্রি.) খ.২, পৃ. ৯০০।)

উপর্যুক্ত মতামতের মধ্যে পঞ্চম মত প্রাধান্য পাওয়াই যুক্তিযুক্ত। কারণ, সে মতানুসারে সকল মুসলিম রাষ্ট্র দারুল ইসলামের অন্তর্ভুক্ত হবে। ফলে তা সুরক্ষায় মুসলিম জনগোষ্ঠী এগিয়ে আসবে। আর ইহুদি জায়নবাদি রাষ্ট্রকে দারুল হারব হিসেবে আখ্যা দেওয়ায় মুসলিম জনগোষ্ঠী দারুল হারব থেকে নিজেদের রাষ্ট্রসমূহ সুরক্ষা করবে এবং ইহুদীদের কর্তৃত্ব কেড়ে নিতে প্রচেষ্টা করবে। বাকি সব অমুসলি রাষ্ট্রকে দারুল আ'হদ হিসেবে আখ্যা দেওয়া মাকাসিদুশ শরীয়াহর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। যেহেতু ইসলাম মানবতার ধর্ম, তাই অহেতুক রক্তপাতের অনুমোদন ইসলাম দেয় না। সুতরাং যারা মুসলিম জনগোষ্ঠীর সাথে শান্তিপূর্ণ আচরণ করে, মুসলিম জনগোষ্ঠীও তাদের সাথে শান্তিপূর্ণ আচরণ করবে।

অমুসলিম রাষ্ট্রে অবস্থান ও তা থেকে হিজরত করা:

ইসলাম ও মুসলমানদের ইতিহাসে হিজরতের একটি বিশেষ স্থান রয়েছে দুটি কারণে। প্রথমত হিজরত হল ইসলামের টিকে থাকার জন্য ও মুসলমানদের পূর্ববর্তী প্রজন্মকে ধর্মীয় বৈষম্যের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে ত্যাগ স্বীকার করেছিলেন তার একটি প্রমাণ। দ্বিতীয়ত মদিনায় হিজরত হিজরী নামে পরিচিত ইসলামী ক্যালেন্ডারের

সূচনা করে। প্রাথমিক অবস্থায় মক্কায় নবী (সা.) ও মুসলমানগণ ইসলামের অনুশীলনে সামাজিক বৈষম্যের শিকার হন। অনেকেই তো নিপীড়নের মুখোমুখি হয়েছিলেন। নবী (সা.) নিজেও হত্যাচেষ্টার লক্ষ্যবস্তু হয়েছিলেন। এটি ছিল মদীনায় হিজরতের টার্নিং পয়েন্ট। ইসলামের ইতিহাসে এই দেশত্যাগই সাধারণত 'হিজরত' নামে পরিচিত। তারপরে হিজরত শব্দটি ধর্মীয় বিশ্বাসের পার্থক্যের কারণে নির্যাতন ও নিপীড়ন থেকে নিরাপত্তা ও মুক্তির সন্ধানে নিজের জন্মভূমি ত্যাগকে বোঝায়। আধুনিক গবেষকদের মধ্যে আলকাহতানি মুসলমানদের জন্য হিজরতের বাধ্যবাধকতার সংক্ষিপ্তসার বর্ণনা করেছেন। যা নিম্নরূপ :

১) অমুসলিম ও অবিশ্বাসীদের দেশ থেকে মুসলমানদের জমিতে হিজরত করা নবী (সা.)এর আমলে বাধ্যতামূলক ছিল এবং তা কিয়ামত পর্যন্ত ফরজ। মক্কা বিজয়ের পর নবী (সা.) যে হিজরতের বাধ্যবাধকতা তুলে নিয়েছিলেন, তা তাঁর উদ্দেশ্যে হিজরত ছিলো। তাই তা রহিত হয়ে যায়। অন্যথায় কেউ যদি দারুল হারবে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে, সে দারুল ইসলামের দিকে হিজরত করতে বাধ্য।

২) মুসলমানদের জন্য বিদ'আতের ভূমি ত্যাগ করা ওয়াজিব।

৩) মুসলমানদের জন্য এমন স্থান ত্যাগ করা বাধ্যতামূলক, যেখানে নিষিদ্ধ প্রথাগুলি ব্যাপক। যেহেতু মুসলমানদের জন্য হালাল অন্বেষণ বাধ্যতামূলক।

৪)শারীরিক নিপীড়ন থেকে পালিয়ে যেতে হবে। এটি মহান আল্লাহর অন্যতম দয়া যে, তিনি সে ব্যাপারে ছাড় দিয়েছেন। যদি কেউ কোনো জায়গায় নিজের নিরাপত্তা নিয়ে শংকিত হয়, তা থেকে মুক্তির জন্য মহান আল্লাহ তাকে সে জায়গা থেকে নিরাপদ জায়গায় স্থানান্তরীত হওয়ার অনুমোদন দিয়েছেন।

৫) মহামারীর সময়ে মানুষকে শহর ছেড়ে যেতে হবে এবং রোগের ভয়াবহতাশেষ না হওয়া পর্যন্ত নিরাপদ জায়গায় থাকতে হবে। তবে প্লেগের সময় এর ব্যতিক্রম ঘটবে।

৬) যদি কেউ তার পরিবারের নিরাপত্তা বা তার সম্পত্তির নিরাপত্তার আশঙ্কা করে, তবে তাকেও পলায়ন করতে হবে কারণ তার সম্পত্তির নিরাপত্তা একজন ব্যক্তির নিরাপত্তার মতো।আর পরিবারের নিরাপত্তা তো সম্পদের নিরাপত্তার চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। (মুহাম্মদ ইবনু সাঈদ আল কাহতানী, আল ওয়ালা ওয়াল বারা ফিল ইসলাম, (রিয়াদ: দারু তাইবা, ষষ্ঠ সংস্করণ, ১৪১৩ হি.) পৃ. ২৮৬-৮৮।)

উসুলুল ফিকহ বা ইসলামী আইনশাস্ত্রের নীতিগুলো বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত হয়। সাধারণত এই উৎসগুলো দুটি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে: কাতয়ী বা অকাট্য ও যান্নি বা অনুমানমূলক। এটা লক্ষণীয় যে, মুসলিম ভূমিতে হিজরতের বাধ্যবাধকতা সম্পর্কে মুসলিম আইনতত্ত্ববিদগণের কাছ থেকে কোন কাতয়ী বিধান সাব্যস্ত নেই এবং সে ব্যাপারে তাদের ঐকমত্যও নেই। এ বিষয়ে আইনবিদদের মতামতের ভিন্নতা লক্ষ করা যায়। "কিছু আইনবিদ যুক্তি দিয়েছেন যে, ইসলাম ও দারুল ইসলাম অবিচ্ছেদ্য। তাই মুসলমানরা কোন অবস্থাতেই অমুসলিম ভূমিতে বসবাস করতে পারে না। অন্যান্য আইনবিদরা হিজরতকে একটি গতিশীল ধারণা হিসাবে মনে করেন। তাইমুসলমানদেরকে এমন জমির জন্য ক্রমাগত অনুসন্ধান করতে হবে, যেখানে তারা আরও বেশি ধর্মীয় পূর্ণতা অর্জন করতে পারে; এই আইনবিদদের মধ্যে কেউ কেউ যুক্তি দিয়েছেন যে, একজন মুসলমানের জন্য অবিশ্বাসীদের মধ্যে বসবাস করা বাঞ্ছনীয় বা বাধ্যতামূলকও হতে পারে।" (K.A. Fadl, Islamic law and Muslim minorities: The juristic discourse on Muslim minorities from the second/ eight to eleventh/ seventeenth centuries, (Islamic Law and Society, 1994) 1(2), p. 145.) উদাহরণস্বরূপ, বেশিরভাগ মালিকী এবং হানাফী আইনবিদগণ মতামত দিয়েছেন যে, কাফির অবিশ্বাসীদের মধ্যে তাদের ভূখণ্ডে বসবাস করা মুসলিমগণের জন্য জায়েজ নয়। এটা শাফিয়ী ও হাম্বলী মাযহাবের বিপরীত মত। যাইহোক, তাদের মতামত হলো শর্তসাপেক্ষে মুসলিমগণ অমুসলিম রাষ্ট্রে অবস্থান করতে পারে। তারা যদি ইসলাম পালন করতে পারে ও কোনো ফিতনার আশংকা না করে, তবে তাদের জন্য তা বৈধ হবে। এমনকিকিছু শাফিয়ী আইনবিদ মনে করেন যে, ক্ষেত্র বিশেষে অমুসলিম রাষ্ট্রে বসবাস করার সুপারিশ

করা হয়। আলমাওয়ার্দী বলেন, "যদি কোনো মুসলিম অবিশ্বাসী দেশে তার ধর্ম প্রকাশ করতে পারে, তাহলে এই দেশটি দারুল ইসলামের অংশ হয়ে যায়। তাই সেখানে বসবাস করা হিজরত করার চেয়ে উত্তম। কারণ, আশা করা যায় যে অন্যরা ইসলাম গ্রহণ করবে (তার ইসলামী আচরণের কারণে)।" (আন নবভী, আল মাজমু, (জেদ্দা: মাকতাবাতুল ইরশাদ) খ. ১৯, পৃ. ২৬৪; শিহাবুদ্দীন আহমদ ইবনু হাজর, ফাতহুল বারী, (বৈরুত: দারুল ফিকর, ২০১১ খ্রি.) খ. ৭, পৃ. ২৩০।)

আল মাওয়ার্দীর এই উক্তির মাধ্যমে নতুন একটি মাত্রা যোগ করেছেন। প্রথমত অমুসলিম রাষ্ট্রে অবস্থান করা হিজরতের চেয়ে উত্তম হতে পারে। দ্বিতীয়ত কখনো দারুল ইসলাম ব্যতিত অন্য যে কোনো ভূখণ্ডে মুসলিমের বসবাসের স্বাধীনতা মুসলিমগণের বসবাস যোগ্য ভূখণ্ডের শ্রেণিবিন্যাসে প্রভাব ফেলবে।

সূরা নিসার ৯৭ নং আয়াতের মাধ্যমে যারা হিজরতের আবশ্যকতার প্রমাণ উপস্থাপন করেন, তাদের প্রমাণ পযার্লোচনা করলে দেখা যায় যে, কোরআনের ব্যাখ্যাকারী মুফাসসিরগণ এ ব্যাপারে একমত হয়েছেন যে, আয়াত দ্বারা বুঝা যায় মুসলিমকে অমুসলিম রাষ্ট্র থেকে হিজরত করতে হবে, যদি সে স্বাধীনভাবে ইসলাম পালন করতে অক্ষম হয় এবং একইভাবে সে খারাপ আচরণের শিকার হয়। তবে সংশ্লিষ্ট আয়াত পরম ও কাতয়ী প্রমাণ হিসেবে ব্যবহার করে বলা যাবে না যে, মুসলিমদেরকে শুধুমাত্র একটি মুসলিম দেশেই থাকতে হবে।

আত তাবারী ব্যাখ্যা করেছেন যে এই আয়াতগুলি মক্কার একটি নির্দিষ্ট গোষ্ঠীকে নির্দেশ করে, যারা ইসলাম গ্রহণ করেছিল এবং মদিনায় নবী (সা.) এর সাথে যোগ দিতে অস্বীকার করেছিল। নবী (সা.) তাদের মদিনায় হিজরত করতে বাধ্য করেছিলেন। কারণ, তারা মক্কায় স্বাধীনভাবে উপাসনা করতে পারছিল না। সুতরাং, এখানে কার্যকারী কারণ ('ইল্লাতুল হুকম) হল ইসলাম অনুশীলনে অক্ষমতা। (আবু জাফর আত তাবারী,জামিউল বায়ান, (বৈরুত: দারুল মারিফা, ১৯৮৬ খ্রি.) পৃ. ১৪৭-৫১।)

খালেদ আবুল ফাদল যুক্তি দিয়ে বলেন যে, কুরআনের এই আদেশ " অবশ্যই একটি ধারাবাহিক ফলাফলের দিকে নিয়ে যায় না। যারা "নিপীড়িত" তাদের দ্বারা কুরআন কী বোঝায় এবং নিপীড়ন কি অমুসলিম ভূমিতে বসবাসের সমার্থক? যদি একটি ইসলামিক ভূখণ্ডে মুসলিম নিপীড়নের সম্মুখীন হয় এবং একমাত্র আশ্রয়স্থল হল অমুসলিম অঞ্চল; এবং কেউ যদি অমুসলিম ভূখণ্ডে পালিয়ে যায় তবে আল্লাহ যা আদেশ করেছেন তা দ্বারা কীভাবে শাসন করা যায়?" (K.A. Fadl, Islamic law and Muslim minorities: The juristic discourse on Muslim minorities from the second/ eight to eleventh/ seventeenth centuries, (Islamic Law and Society, 1994) 1(2), p. 144.)

মিশরের সাবেক গ্র্যান্ড মুফতি শেখ জাদ আলহক আলী জাদ আলহক একটি ধর্মীয় আদেশ জারি করেছেন, "একজন মুসলিম অমুসলিম দেশে বসবাস করতে পারে যদি সে সেখানে শান্তিপূর্ণ ও স্বাধীনভাবে ইসলাম পালন করতে পারে। শুধুমাত্র তার ধর্মীয় স্বাধীনতা, তার মর্যাদা ও সম্পদের সংরক্ষণের ভয় থাকলে তার জন্য হিজরত করা বাধ্যতামূলক হয়ে যায়।" (সুলাইমান মুহাম্মদ তুবুলিয়্যাক, আল আহকামুস সিয়াসিয়্যাহ লিল আকাল্লিয়্যাতিল মুসলিমাহ, (আম্মান: দারুন নাফায়িস, ১৯৯৭ খ্রি.) পৃ. ৫৪।)

আলকাহতানি সহ যারা হিজরতের ব্যাপারে জোর দিয়েছেন, তারা আরও যুক্তি উপস্থাপন করেন যে, আল ওয়ালা ওয়াল বারা ও হিজরতের মধ্যে অন্তর্নিহিত পারস্পরিক সম্পর্ক রয়েছে। মুসলমানদের অবিশ্বাসীদের মধ্যে না থাকার জন্য নবীর মৌখিক নির্দেশ থেকে তা স্পষ্ট। কাফেরদের থেকে এই বিচ্ছিন্নতা বা আল বারা' অপরিহার্য যাতে, মুসলমানরাএমন সমস্যায় না পড়ে,যা তাদের বিশ্বাসকে দুর্বল করতে পারে।(মুহাম্মদ ইবনু সাঈদ আল কাহতানী, আল ওয়ালা ওয়াল বারা ফিল ইসলাম, (রিয়াদ: দারু তাইবা, ষষ্ঠ সংস্করণ, ১৪১৩ হি.) পৃ. ২২১।) মুসলমানদের একে অপরের কাছাকাছি থাকা নিশ্চিত করার জন্যও এই পদক্ষেপ ছিল। তখন আলকাহতানি একটি হাদিস উদ্ধৃত করেন যাতে বলা হয়, "আমি এমন কোনো মুসলমানের জন্য দায়ী নই, যে কাফেরদের মধ্যে থাকে।" তারা জিজ্ঞেস করল,

কেন, আল্লাহর রাসূল? তিনি বললেন: "তাদের আগুন একে অপরের কাছে দৃশ্যমান হওয়া উচিত নয়।" (প্রাগুক্ত)

এই হাদিসটি গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় যে, এই উপদেশটি এমন সময়ে জারি করা হয়েছিল যখন মক্কায় মুসলমানদের প্রতি ঘৃণা চরমে ছিল। যারা নবীর হিজরতের পর মক্কায় থাকতে চেয়েছিলেন, তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত হলেই তা করার অনুমতি দেওয়া হয়েছিলো। অন্যথায় তাদের হিজরত করতে হবে। হিজরতের ইস্যুতে, এমন অনেক হাদিস রয়েছে, যার মাধ্যমে এটা প্রমাণিত হয় যে, নবী (সা.) তাঁর সঙ্গীদের অমুসলিমদের সাথে বসবাস করতে অনুমতি দিয়েছিলেন এবং তাদের কাছ থেকে সুরক্ষিত থাকতে বলেছিলেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, নবী (সা.)তার চাচা আব্বাস (রা.) কে মক্কায় থাকার অনুমতি দিয়েছিলেন, যেটা তখন মুসলিম শাসনের অধীনে ছিল না। অন্য একটি দৃষ্টান্তে আমরা দেখতে পাই, আবিসিনিয়ায় (ইথিওপিয়া) সাহাবীগণের হিজরত ওমদিনায় নবী (সা.) এর হিজরতের ছয় বছর পর তাদের প্রত্যাবর্তন, এটিও নির্দেশ করে যে হিজরত কেবলমাত্র তাদের জন্য প্রয়োজনীয় যারা দূর্বল ও ধর্মীয় নিপীড়নের শংকায় ছিলো।

উপর্যুক্ত বিবরণগুলি এই বাস্তবাতাকে সমর্থন করে যে, নবী (সা.) এর মদিনায় হিজরত করার পর অনেক মুসলিম মক্কায় অবস্থান করাকে প্রাধান্য দিয়েছিলেন।

আবু নুয়াইম (রা.) নবী (সা.) এর একজন সাহাবী। তিনি তাঁর গোত্রের এতিম ও বিধবাদের একটি গ্রুপের আর্থিক যোগানদাতা ছিলেন। তিনি তার হিজরত স্থগিত করেছিলেন। কারণ, তাঁর গোত্রের অবিশ্বাসীরা তাকে থাকতে অনুরোধ করেছিল। তারা তাঁর অব্যাহত সেবার বিনিময়ে তার নিরাপত্তা এবং তার সুরক্ষার নিশ্চয়তা দিয়েছে। অবশেষে তিনি যখন মদিনায় হিজরত করলেন, তখন নবী তাকে বললেন; “আমার লোকেরা আমাকে বহিষ্কার করেছে এবং আমাকে হত্যা করতে চেয়েছে। যখন আপনার লোকেরা আপনাকে রক্ষা করেছে।” (আবু আব্দিল্লাহ মহাম্মদ ইবনু সা'দ, আত তাবাকাতুল কুবরা,(কায়রো: মাকতাবাতুল খানজি, ২০০১ খ্রি.) খ. ৪ পৃ. ১২৯; ইজ্জুদ্দীন আবুল হাসান ইবনুল আসীর,উসুদুল গাবাহ ফী মারিফাতিস সাহাবাহ, (বৈরুত: দারু ইবনি হাযম, ২০১২ খ্রি.) পৃ. ১২০০।)

এটি প্রমাণ করে যে, একজন মুসলিমযদি তার বা তার পরিবারের বিরুদ্ধে নিপীড়ন বা বৈষম্যের ভয় ছাড়াই নিজের বিশ্বাস অনুশীলন করার স্বাধীনতা উপভোগ করে, তবে সে তার এলাকায় থাকতে পারে।

ফুদাইক (রা.) আরেকজন সাহাবী। নবী মুহাম্মদ (সা.)কে বলেছিলেন: "নিশ্চয় অনেক লোক অভিযোগ করে যে, যে হিজরত করবে না, সে ধ্বংস হয়ে যাবে।" নবী (সা.) বললেন, হে ফুদাইক! নামায কায়েম কর (দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ), যাকাত দাও, মন্দ কাজ থেকে বিরত থাক এবং তোমার লোকদের সাথে যেখানে খুশি থাকো।" ফুদাইক বলেন, “আমি অনুমান করি যে নবী (সা.) বলেছেন “(তখন) তুমি তাদের মত যারা হিজরত করেছিল।” (আল আসবাহানী, মারিফাতুস সাহাবাহ, (রিয়াদ: দারুল ওয়াতান, ১৯৯৮ খ্রি.) পৃ. ৪০৬।)

অন্য একটি বর্ণনায় একজন বেদুইন নবী (সা.)র কাছে গিয়েছিলেন, যিনি তাকে হিজরত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন। তিনি বললেন: “হায়! তোমার দেশত্যাগ খুবই কঠিন। তোমার কি উট আছে?" সে হ্যাঁ বলেছে। " তিনি বললেন, তুমি কি তাদের উপর যাকাত দাও? সে হ্যাঁ বলেছে। " তিনি বললেন, "তাহলে সমুদ্রের ওপারে বসবাস করলেও ভালো কাজ করো। কারণ, আল্লাহ কখনোই তোমার কোনো ভালো কাজকে প্রতিদানহীন রাখবেন না।" (মুহাম্মদ ইবনু ইসমাঈল আলবুখারী,সহীহুল বুখারী, (করাচি: আল বুশরা, ২০১৬ খ্রি.) পৃ. ১২৪০।)

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নওমুসলিমদের ব্যাপারে তাঁর সেনাবাহিনীকে নির্দেশ দিতেন, যেন তাঁরা বলে দেন,

إن هاجرتم فلكم ما للمهاجرين وإن أقمتم فأنتم كأعراب.

যদি তোমরা হিজরত করো, তবে মুহাজিরগণের জন্য যা প্রযোজ্য, তোমাদের জন্যও তা প্রযোজ্য হবে। যদি তোমরা নিজেদের জায়গায় অবস্থান করো, তবে তোমরা অনারবদের মত থাকবে। (মুহাম্মদ ইবনু ইদরীস আশ শাফিয়ী, আল উম্মু, (বৈরুত: দারুল ফিকর, ১৪০০ হি.) খ. ৪, পৃ. ১৬১।)

এই হাদিসটি হিজরতের বিতর্কের ব্যাপারে বর্তমান যুগের প্রেক্ষাপটকে বর্ণনা করে। এটা বিশেষ করে এমন মুসলিমগণের জন্য প্রাসঙ্গিক, যারা যে কোনো দেশে সংখ্যালঘু গোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব করে। যদি তারা সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানদের দ্বারা বেষ্টিত থাকতে পছন্দ করে বা যদি এমন মুসলিম রাষ্ট্র, যা তাদেরকে উত্তম জীবন ব্যবস্থা প্রদান করে, যেমনটি অতীতে মদিনা করেছিল, তাহলে তারা একটি মুসলিম রাষ্ট্রে হিজরত করার কথা বিবেচনা করতে পারে। এই হাদিসটি একটি বিকল্পের প্রস্তাব দিয়েছে। হিজরতের ব্যাপারে সরাসরি নির্দেশনা দেয়নি।

মুসলিমগণেরসেই বিকল্পটি ব্যবহার করার স্বাধীনতা রয়েছে। উপর্যুক্ত প্রমাণসমূহ থেকে এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে, অমুসলিম দেশগুলোতে বসবাসকারী মুসলমানদের পক্ষে বা বিপক্ষে কোনো সাধারণ রায় হতে পারে না। রায় নির্ভর করে ব্যক্তির অবস্থা ও প্রেক্ষাপটের ওপর। এটাও স্পষ্ট যে, মুসলমানদের অমুসলিম দেশে বসতি স্থাপনে নিষেধজ্ঞার ব্যাপারে ইসলামী আইনতত্ত্ববিদগণের ঐকমত্য নেই। তাই হিজরতের বিধান পরিস্থিতি ও প্রেক্ষাপটের উপর নির্ভরশীল। তাই আমরা সংক্ষিপ্তভাবে বলতে পারি:

ক) একজন মুসলমানের জন্য অমুসলিম রাষ্ট্র থেকে মুসলিম রাষ্ট্রের দিকে হিজরত বাধ্যতামূলক যদি সে তার ধর্ম পালন করতে না পারে এবং আশংকা করে যে, সে তার ধর্মীয় বিশ্বাসের উপর অবিচল থাকতে পারবে না;

খ) যে মুসলিমগণ অমুসলিম রাষ্ট্রে ইসলাম পালন করতে পারে এবং মুসলিম রাষ্ট্রে হিজরত করার সামর্থ্য রাখে, তাদেরকে হিজরত করতে উৎসাহিত করা হবে;

গ) যে সমস্ত মুসলমানের অমুসলিম রাষ্ট্র থেকে মুসলিম রাষ্ট্রের দিকে হিজরত করার সামর্থ্য নেই বা হিজরত করতে গেলে অসুবিধার সম্মুখীন হবে, তাদের হিজরত করার প্রয়োজন নেই এবং তারা সেই দেশেই থাকতে পারে;

ঘ) একজন মুসলমানের জন্য একটি অমুসলিম দেশে থাকা বাধ্যতামূলক, যদি তার উপস্থিতি এবং দক্ষতা সেখানে মুসলমানদের প্রয়োজন হয়।

ঙ) একজন মুসলমানের জন্য একটি অমুসলিম দেশে থাকা উত্তম, যদি তার উপস্থিতি ও দক্ষতা সেখানে মুসলমানদের সহায়ক হয়।

উপসংহার:

অমুসলিম রাষ্ট্র থেকে মুসলিম রাষ্ট্রের দিকে হিজরতের বাধ্যবাধকতা ও মুসলমানদের শুধুমাত্র দারুল ইসলামে বসবাস করতে হবে মর্মে যে মতামত ব্যক্ত করা হয়, তা অনেকগুলো ভিন্ন মতের মধ্যে একটি হিসাবে দেখা যেতে পারে। যদিও ইসলামে হিজরতের ধারণা বিদ্যমান রয়েছে এবং এর একটি ব্যাপক অর্থ রয়েছে, তবে পরিস্থিতি এবং প্রেক্ষাপটের উপর নির্ভর করে সময়ে সময়ে এর প্রয়োগ ও ব্যবহার পরিবর্তিত হতে পারে।

পাশাপাশি আজকের প্রেক্ষাপটে মুসলিম রাষ্ট্রে হিজরত করা অপ্রাসঙ্গিক এবং প্রকৃত দারুল ইসলামে হিজরত করা আদৌ সম্ভব নয়। কারণ, বর্তমান বিশ্বের কোন নির্দিষ্ট রাষ্ট্রকে অবিকল মদীনার মতো দারুল ইসলাম হিসেবে সাব্যস্ত করা যায় না।একজন মুসলিমকে একটি ব্যাপক ধর্ম হিসেবে ইসলাম পালন করার অনুমতি দেওয়াই হিজরতের মূল উদ্দেশ্য। কিন্তু বর্তমান বিশ্বেএমন কোনো রাষ্ট্র নেই, তা মুসলিম বা অমুসলিম রাষ্ট্র যাই হোক না কেন, যা হিজরতের মূল উদ্দেশ্য পূরণের জন্য পুরোপুরি উপযুক্ত। বাস্তবতা হলো একজন মুসলমান যেখানেই বসবাস করতে চায়, তাকে এখনও তার সমাজের সাথে সমন্বয় করে তার জন্য উপযুক্ত বাসস্থান ও থাকার ব্যবস্থা করতে হবে।

এটা সত্য যে হিজরতের ব্যাপারে আলকাহতানি যে যুক্তি তুলে ধরেছেন, তার প্রমাণ ধর্মীয় উৎস ও ইসলামী পণ্ডিতগণের লেখা থেকে নেওয়া হয়েছে। অমুসলিম দেশে বসবাসের নিষেধাজ্ঞার বিষয়ে যে সব প্রমাণ উপস্থাপন করা হয়েছে, তা তখনই প্রযোজ্য যখন কোনো মুসলিম তার ধর্মের আচার-অনুষ্ঠান পালনে অক্ষম হয়, ধর্মীয় নিপীড়নের ভয় পায় এবং তার ধর্মের কারণে নিজের, পরিবারের ও সম্পদের ব্যাপারে নিরাপত্তাহীনতায় ভোগে।

আলকাহতানি তার যুক্তি উপস্থাপনে বর্তমান সামাজিক-রাজনৈতিক পরিবেশের সাথে হিজরতের বিধানকে প্রাসঙ্গিক করতে ব্যর্থ হয়েছেন। বর্তমান

সময়ের সাথে প্রাসঙ্গিক হওয়া ইসলামের অন্যতম মৌলিক বৈশিষ্ট্য। এর মানে ইসলাম নিয়ম নির্ধারণে ও ধর্ম পালনে সময়, পরিবেশ, ব্যক্তি ও অন্যান্য বিষয়ের বাস্তবতা বিবেচনা করে। তাই বাস্তবতার পার্থক্যের কারণে কোনো নির্দিষ্ট বিষয়ের হুকুম ও বিধান ভিন্ন হতে পারে।

একজন ভাল মুসলমান হিসাবে গণ্য করা হয় এমন একজনকে, যিনি ধর্মের মৌলিক বিষয়গুলিকে সমুন্নত রাখেন এবং প্রয়োজনের সময় শিক্ষাগুলিকে প্রাসঙ্গিক করতে সক্ষম হন। এটি কুরআনের শিক্ষার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। মহান আল্লাহ বলেন,

لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت.

“আল্লাহ কোন আত্মার উপর (কর্তব্য) চাপিয়ে দেন না কিন্তু তার সামর্থ্য অনুযায়ী; এটি যা অর্জন করেছে তার (সুফল)তার জন্য এবং এটি যা করেছে তার (অকল্যাণ) তার উপর। (কুরআন ২: ২৮৬)

ইসলাম স্বীকার করে যে, মানুষ তার সক্ষমতার মধ্যে সহজাতভাবে সীমাবদ্ধ। সুতরাং মুসলমানরা কেবলমাত্র তাদের যথাসাধ্য চেষ্টা করতে বাধ্য এবং সীমাবদ্ধতার বাইরে সে চেষ্টা করতে বাধ্য নয়। এটাই ইসলামের প্রেক্ষাপটের সারমর্ম।

আল কাহতানী প্রমূখকে মুসলিম পিতামাতাদের সমালোচনা করতেও দেখা যায় যে, তারা তাদের সন্তানদের অমুসলিম দেশে (পশ্চিমা দেশ) ইসলাম এবং আরবি অধ্যয়নের জন্য পাঠান। তাদের ভাষ্য মতে এখনও এই বিষয়ের ব্যাপারে অনেক মুসলমানের মধ্যে একটি উদাসীন মনোভাব দেখতে পাওয়া যায়। তারা ঠিকই আমাদের শত্রুদের সাথে বন্ধুত্ব গড়ে তোলে। এমন কিছু মুসলমান আছেন, যারা তাদের সন্তানদেরকে ইউরোপ ও আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামী আইন ও আরবি পড়ার জন্য পাঠান!

এটি বিংশ শতাব্দীর সেই মুসলমানদের মূর্খতার একটি অযৌক্তিক স্মৃতিস্তম্ভ হিসাবে দাঁড়িয়ে থাকবে, যারা তাদের সন্তানদেরকে কাফেরদের কাছে পাঠিয়েছিল ইসলামী আইন ও আরবি অধ্যয়নের জন্য!” (মুহাম্মদ ইবনু সাঈদ আল কাহতানী, আল ওয়ালা ওয়াল বারা ফিল ইসলাম, (রিয়াদ: দারু তাইবা, ষষ্ঠ সংস্করণ, ১৪১৩ হি.) পৃ. ২২৬।)

এর জবাবে আমরা বলতে পারি যে, এমন কোন প্রমাণ নেই, যা জ্ঞানের উদ্দেশ্যে অমুসলিম দেশে ভ্রমণকে হারাম (নিষিদ্ধ) বলে। মুসলমানদের অমুসলিম সহ যেকোনও জায়গা থেকে শিখতে এবং উপকৃত হতে উৎসাহিত করা হয়। এটি আরও জরুরি হয়ে ওঠে যদি মুসলিম রাষ্ট্রে জ্ঞানের একটি নির্দিষ্ট ক্ষেত্র পাওয়া না যায়, অথচ মুসলমানদের জন্য এটার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়।

উপরে উপস্থাপিত যুক্তিসমূহ ও অমুসলিম রাষ্ট্রে বসবাসকারী সংখ্যালঘু মুসলমানগণের বাস্তবতার ভিত্তিতে অমুসলিম রাষ্ট্রেতাদের বসবাসকে নেতিবাচকভাবে নেওয়া উচিত নয়।

প্রকৃতপক্ষে, বর্তমান আধুনিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় এমন কোন রাষ্ট্র নেই, মুসলিম রাষ্ট্র হোক বা অমুসলিম রাষ্ট্র, যা নিখুঁতভাবে সমস্ত শর্ত পূরণ করে মুসলমানদেরকে তাদের ধর্ম পালন করতে দেয়। একজন মুসলিম আজ যেখানেই যান না কেন, তিনি এমন পরিস্থিতির মুখোমুখি হবেন, যার কারণে একটি আদর্শ মুসলিম সম্প্রদায় গঠন করতে তার অনেক প্রচেষ্টা ও তদবির করতে হয়। খুব সহজে কেউ আদর্শ মুসলিম হিসেবে কালাতিপাত করতে পারে না।

সর্বোপরি অমুসলিম রাষ্ট্রে অবস্থান করা মুসলমানগণের জন্য কখনো অসম্মানজনক নয়। ইসলামী রাষ্ট্রে বসবাসকারী মুসলিমগণের তুলনায় তাকে দূর্বল মুসলিম বলা যায় না। বরং বলতে গেলে অমুসলি রাষ্ট্রে বসবাসের ফলে অমুসলিমদের মাঝে ইসলামের বাণী ছড়িয়ে দেওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হয়। যা মহান আল্লাহর কাছ থেকে পুরষ্কার অর্জনের সুযোগ করে দেয়। যেমন হাদিসে উল্লেখ করা হয়েছে: "আল্লাহর কসম, যদি আল্লাহ আপনার প্রচেষ্টার মাধ্যমে কাউকে হেদায়েত করেন, তবে তা লাল উটের চেয়েও উত্তম।" (মুহাম্মদ ইবনু ইসমাঈল আলবুখারী,সহীহুল বুখারী,(বৈরুত: দারু ইবনি কাসীর, ২০০২ খ্রি.) পৃ. ৭৪২।)

যদি ইসলাম মুসলমানগণকে অমুসলিম রাষ্ট্রে থাকার অনুমতি দেয় এবং তারা যদি সেখানে বসবাস করতে পছন্দ করে, তাহলে সেখানে থাকার অঙ্গীকারের

ভিত্তিতে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি এবং চিন্তার ভিত্তি তৈরি করা তাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। গণতন্ত্র, ন্যায়বিচার ও ইসলামের অনুশীলনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ গঠনমূলক পরামর্শ ও সমালোচনা প্রদানের দাইয়িত্বকে অবহেলা না করে তাদের দেশের উন্নয়নে গঠনমূলকভাবে অংশগ্রহণ করা উচিত। ইসলাম এমন একটি ফ্যাক্টর হয়ে উঠবে না, যা অমুসলিমদের সাথে বা অমুসলিম রাষ্ট্রে বসবাসের কারণে মুসলমানদের উপর মানসিক বা অন্যান্য অসুবিধা চাপিয়ে দেয়।

পরিশেষে একটি বিস্তৃত ও ব্যাপক অর্থে ইসলামে হিজরত শুধুমাত্র দারুল কুফর থেকে দারুল ইসলামের এক স্থান থেকে অন্য স্থানে স্থানান্তরিত হওয়ার কাজকে বোঝায় না। ধারণাটি আধ্যাত্মিক হিজরতকেও বুঝায়, যার অর্থ হল খারাপ থেকে ভালো ও ভালো থেকে উত্তমের দিকে প্রত্যাবর্তন করা। এটি একটি অবিচ্ছিন্ন ও গতিশীল প্রক্রিয়া যা একজন মুসলমানের সারা জীবন জুড়ে ঘটে।

গ্রন্থপঞ্জি :

(১) আবুল ফযল ইবনু মানযুর, লিসানুল আরব, বৈরুত: দারু সাদির, প্রথম সংস্করণ) খ. ৫, পৃ. ২০৫।

(২) আবুল হুসাইন ইবনু ফারিস, মুজামু মাকায়িসুল লুগাহ, (ইত্তিহাদুল কিতাবিল আরব, ২০০২ খ্রি.) খ. ৬, পৃ. ৩৪।

(৩) হারিস সুলাইমান আল ফারুকী, আল মুজামুল কানুনী, (বৈরুত: মাকতাবাতু লুবনান, পঞ্চম সংস্করণ, ২০০৮ খ্রি.) পৃ. ৩৪৭।

(৪)Elizabeth A. Martin, *A Dictionary of Law*, (Oxford: Oxford University Press, Fifth Ed. 2003) p. 241.

(৫) জালালুদ্দীন সুয়ুতী, হাশিয়াতুস সুয়ুতী ওয়াস সুনদী আলা সুনানিন নাসায়ী, বৈরুত : দারুল মারিফা, ১৪২৪ হি.)খ. ৫ পৃ. ৪৬৫।

(৬) মুহাম্মাদ রাওয়াস কালাজী, মুজামু লুগাতিল ফুকাহা, (বৈরুত: দারুন নাফায়িস, প্রথম সংস্করণ, ১৯৯৬ খ্রি.) পৃ. ৪৬৪।

(৭) আব্দুর রহমান ইবনু কুদামাহ, আশ শারহুল কবীর, (বৈরুত: দারুল কিতাবিল আরবী লিন নাশর, তাহকীক: রশীদ রেজা) খ. ১০, পৃ. ৩৭৯।

(৮) আবু বকর ইবনুল আরাবী, আহকামুল কুরআন, (বৈরুত: দারু ইহইয়াউত তুরাসিল ইলমী, প্রথম সংস্করণ, তাহকীক: আলী মুহাম্মদ) খ. ১, পৃ. ৪৮৪।

(৯) শিহাবুদ্দীন আহমদ ইবনু হাজর, ফাতহুল বারী, (বৈরুত: দারুল ফিকর, ২০১১ খ্রি.) খ. ১, পৃ. ১৬।

(১০) আবু বাসীর আত তারতুসী, আল হিজারাতু মাসায়িলু ওয়া আহকাম, ২০০১খ্রি.) পৃ. ১১।

(১১) ফালাহ জারদুমি, ফিকহুস সিয়াসাতুশ শরয়িয়্যাহ লিল আকাল্লিয়্যাতিল মুসলিমাহ, ২০০৬ খ্রি., পৃ. ১৫২।

(১২) ইমাম আহমদ, মুসনাদুল ইমাম আহমাদ, (মুআসসাসাতুর রিসালাহ, তাহকীক: আল আরনাউত) খ. ১১, পৃ. ৫১১।

(১৩) ড. মারযুক আব্দুস সাবুর, মাফাহীমু ইসলামিয়্যাহ, (মুআসসাসাতুর রিসালাহ, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৯৩ খ্রি.) পৃ. ৩০৬।

(১৪) আলী আল কাজী আল জুরজানী, আত তা'রীফাত, (বৈরুত: দারুল কিতাবিল আরবী, ১৪০৫ হি.) খ. ১, পৃ. ৩১৯।

(১৫) মুহাম্মদ ইবনু সাঈদ আল কাহতানী, আল ওয়ালা ওয়াল বারা ফিল ইসলাম, (রিয়াদ: দারু তাইবা, ষষ্ঠ সংস্করণ, ১৪১৩ হি.) পৃ. ৪০।

(১৬) মুহাম্মদ ইবনু সাঈদ আল কাহতানী, আল ওয়ালা ওয়াল বারা ফিল ইসলাম, (লন্ডন: আল ফিরদাউস লিমিটেড, ১৯৯২ খ্রি.) খ. ২, পৃ. ৫।

(১৭) নাসিরুদ্দীন আল বায়জাভী, তাফসীরুল বায়জাভী, (ইস্তাম্বুল: মাকতাবাতুল হাকীকাহ, ১৯৯৮ খ্রি.) পৃ. ৯২।

(১৮) ইমাদুদ্দীন ইবনু কাসীর, তাফরীরুল কুরআনিল আজীম, (কর্ডোবা: মুআসসাসাতু কারতুবা, ১৯৯৯ খ্রি.) পৃ. ৩৯১।

(১৯) সাঈদ কুতুব, ফী যিলালিল কুরআন, (কায়রো: দারুশ শুরুক, ২০০৪ খ্রি.) পৃ. ৭৪৩।

(২০) সুলাইমান মুহাম্মদ তুবুলিয়্যাক, আল আহকামুস সিয়াসিয়্যাহ লিল আকাল্লিয়্যাতিল মুসলিমাহ, (আম্মান: দারুন নাফাইয়িস, ১৯৯৭ খ্রি.।

(২১) ড. ওয়াহবাহ আয যুহাইলী, আসরারুল হারব, (দারুল ফিকর, তৃতীয় সংস্করণ, ১৯৯৮ খ্রি.) পৃ. ১৬৭।

(২২) আব্দুল ওয়াহহাব খাল্লাফ, আস সিয়াসাহ আশ শরয়িয়্যাহ, (মুআসসাসাতুর রিসালাহ, ২০০১ খ্রি.) পৃ. ৬৬।

(২৩) মুহাম্মদ ইবনু ইদরীস আশ শাফিয়ী, আল উম্মু, (দারুল ওয়াফা, ২০০১ খ্রি.) খ. ১, পৃ. ১৮২।

(২৪) ড. আব্দুল আজীজ আল আহমদী, ইখতিলাফুদ দারাইন ওয়া আসারুহু, (মদীনা: আল জামিয়াতুল ইসলামিয়্যাহ, প্রথম সংস্করণ, ২০০৪ খ্রি.) খ. ১, পৃ. ৩০১।

(২৫) মুহাম্মদ অবু যাহরা, নাযারিয়্যাতুল হারব ফিল ইসলাম, (কায়রো: দারুল ফিকর, ২০০৯ খ্রি.) পৃ. ১৪।

(২৬) ড. ইউসুফ আল কারজাভী, ফিকহুল জিহাদ, (মাকতাবাতু ওয়াহবাহ, ২০০৯ খ্রি.) খ. ২, পৃ. ৮৮০।

(২৭) আব্দুর রহমান অস সা'দী, আল ফাতওয়াস সাদীয়্যাহ (কুয়েত: মারকাযুল বুহুস ওয়াদ দিরাসাত, ২০০২ খ্রি.) খ. ১, পৃ. ৯২।

(২৮) শামসুল আইম্মা মুহাম্মদ আস সুরাখসি, শারহুস সিয়ারিল কাবির, (দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, তাহকীক: মুহাম্মদ হুসাইন) খ. ৩, পৃ. ৮১।

(২৯) আলা উদ্দীন আল কাসানী, বাদাইউস সানাই, (বৈরুত: দারুল কুতুবিল আরবী, ১৯৮২ খ্রি.) খ. ৭, পৃ. ১৩০।

(৩০) মুহাম্মদ আবু যাহরা, আল আলাকাতুদ দুয়ালিয়্যাহ ফিল ইসলাম, (দারুল ফিকরিল আরবী, ১৯৯৫ খ্রি.) পৃ. ৫৭।

(৩১) শামসুদ্দীন আবু আব্দিল্লাহ ইবনু কাইয়িম, আহকামু আহলিজ জিম্মাহ, (বৈরুত: দারু ইবনি হাযম, প্রথম সংস্করণ, ১৯৯৭ খ্রি.) খ. ২, পৃ. ৭২৮।

(৩২) A.K. Lambton, *State and Government in Medieval Islam*, (Oxford: Oxford University Press, 1981) p.261.

(৩৩) আতিয়া সাকার, বয়ান লিন নাস, কায়রো: আল আযহারুশ শরীফ।

(৩৪) আবু সালমান ফারিস আয যাহরানী, আল আলাকাতুদ দুয়ালিয়্যাহ ফিল ইসলাম, (মারকাযুদ দিরাসাত ওয়াল বুহুসুল ইসলামিয়্যাহ) খ. ১, পৃ. ৭৩।

(৩৫) K.A. Fadl, Islamic law and Muslim minorities: The juristic discourse on Muslim minorities from the second/ eight to eleventh/ seventeenth centuries, (Islamic Law and Society, 1994) 1(2), p. 145.

(৩৬) আন নবভী, আল মাজমু, (জেদ্দা: মাকতাবাতুল ইরশাদ) খ. ১৯, পৃ. ২৬৪।

(৩৭) আবু জাফর আত তাবারী,জামিউল বায়ান, (বৈরুত: দারুল মারিফা, ১৯৮৬ খ্রি.) পৃ. ১৪৭-৫১।

(৩৮) আবু আব্দিল্লাহ মহাম্মদ ইবনু সা'দ, আত তাবাকাতুল কুবরা,(কায়রো: মাকতাবাতুল খানজি, ২০০১ খ্রি.) খ. ৪ পৃ. ১২৯।

(৩৯) ইজ্জুদ্দীন আবুল হাসান ইবনুল আসীর, উসুদুল গাবাহ ফী মারিফাতিস সাহাবাহ, (বৈরুত: দারু ইবনি হাযম, ২০১২ খ্রি.) পৃ. ১২০০।

(৪০) আল আসবাহানী, মারিফাতুস সাহাবাহ, (রিয়াদ: দারুল ওয়াতান, ১৯৯৮ খ্রি.) পৃ. ৪০৬।

(৪১) মুহাম্মদ ইবনু ইসমাঈল আলবুখারী, সহীহুল বুখারী, (করাচি: আল বুশরা, ২০১৬ খ্রি.) পৃ. ১২৪০।

(৪২) মুহাম্মদ ইবনু ইসমাঈল আলবুখারী, সহীহুল বুখারী, (বৈরুত: দারু ইবনি কাসীর, ২০০২ খ্রি.) পৃ. ৭৪২।